দৈনিক সংবাদ
তারিখ 19 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

# আজও খুঁজে ফিরি সেই শিক্ষকদের

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

**আজ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত আলোচনায় এসব কিছুর জন্য অভিযুক্ত হচ্ছে ছাত্র–রাজনীতি, শিক্ষক–রাজনীতি, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষিত সচেতন সমাজের। সেই শিক্ষিত সচেতন সমাজের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষক এবং ছাত্র। সরকারী চাকরিতে রয়েছেন শিক্ষিত সমাজের এক অংশ। তাদের জন্য তো রাজনীতি নিষিদ্ধ। এমত অবস্থায় ছাত্র শিক্ষকদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দিলে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা কি একটা ক্ষুদ্র ক্ষীণ স্রোতে পরিণত হবে না? এতে সত্যিকার গণতান্ত্রিক বিনির্মাণ কি সম্ভব হবে?**

আমার কৈশোরের দু'জন শিক্ষকের কথা আজ বেশি করে মনে পড়ছে এবং তা বিশেষ কারণে– তাঁরা দু'জনেই মনে করতেন বিদ্যা বেত্রাঘাত নামক অনুপান সহযোগেই অর্জনীয় এবং বিদ্যা দানের সঙ্গে এই অনুপানটি দিতে কার্পণ্য করতেন না। একজন গ্রামের মাইনর স্কুলের সেকেন্ড টিচার নরেন্দ্র বাবু, অন্যজন মহকুমা শহরের হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক বঙ্কিম বাবু। ইংরেজী শব্দের বানানে ভুল করে প্রথম জনের এবং অত্যন্ত কঠিন বাংলা শব্দের অর্থ বা প্রতিশব্দ বলতে না পেরে দ্বিতীয় জনের হাতে প্রায় প্রত্যহ প্রহৃত হয়েছি। সেদিন স্বাভাবিকভাবেই কিশোর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বুদ্বুদ সৃষ্টি হতো এবং তা মিলিয়ে যেতো। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তাঁদের হাতে মার খাওয়া আমার জীবনের এক পরম পাওয়া, না পেলে ইংরেজী, বাংলা কোন ভাষাই হয়তো শেখা হতো না।

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটা প্রতিবেদন আজ তাদের কথা মনে করিয়ে দিলো। প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে মর্মাহত হওয়ার মতো। গত দু'মাসে ছাত্রদের হাতে পঞ্চাশ জন শিক্ষক প্রহৃত হয়েছেন এবং এ ধরনের ঘৃণ্যতম ঘটনার প্রায় সবগুলোই ঘটেছে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেকালে শিক্ষকের বেত্রাঘাত পড়তো শিক্ষার্থীর পিঠে, কিন্তু সে আঘাত ছিল এক অকৃত্রিম এবং আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত, শাসন ছিল অনাবিল স্নেহরস–সিক্ত, পুত্রের প্রতি পিতার শাসনের মতো। আঘাতে যন্ত্রণা ছিল, কিন্তু পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর শিক্ষক যখন কল্যাণ কামনায় মাথায় হাত রাখতেন, বুকে জড়িয়ে ধরতেন তখন তাদের দেয়া আঘাতকে মনে হতো আশীর্বাদ। একালে ছাত্রের হাতে প্রহৃত, লাঞ্ছিত হন শিক্ষক। দেশ, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা–সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র— সব কিছুর অগ্রগতির আবর্তে শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীর হস্তাঘাত, অস্ত্রাঘাতের শিকার। একে কি বলবো, অগ্রগতি না অধোগতি, বিকাশ না বিকৃতি? আসলে আঘাত হানে ছাত্র নয়, শিক্ষার্থী নয়, তার ভেতর গজিয়ে ওঠা দুর্বৃত্তটি যা আমাদের সফলের, ব্যাধিগ্রস্ত এই সমাজের এক অনাসৃষ্টি। এই 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'–এর জন্ম দিয়েছি আমরা সকলে মিলে— কেউ সক্রিয় হয়ে, কেউবা নিষ্ক্রিয় নির্বিকার থেকে। একে লালন করেছি, প্রশ্রয় দিয়েছি। এখন এ নিয়ে প্রতিবাদ করবো কার বিরুদ্ধে? দোষারোপ করবো কাকে? কোন্ মন্ত্রী কোন্ সন্ত্রাসী ছাত্রদের সাহায্যে কতটুকু এগিয়ে গেছেন, কোন্ নেতা গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদের, তা নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় না তুলে, কাদা ছোড়াছুড়ি না করে সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আত্ম–বিশ্লেষণের, আন্তরিকতার সঙ্গে একে প্রতিহত করতে এগিয়ে যাওয়া, দোষমুক্ত আমরা অনেকেই নই— এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়া।

ভুল আমরা করেছি অনেক আগেই, যেদিন এদেশের যুগযুগান্তের ঐতিহ্যবাহী গুরু–শিষ্যের পিতাপুত্র সম্পর্ককে, শিক্ষার্থী শিক্ষকের হেফাজত— এই ধারণাকে অতীতমুখী অন্ধত্ব, অনগ্রসরতা বলে পরিত্যাগ করে বাইরে থেকে সংক্রমিত মার্কেন্টাইল কালচার (Mercantile Culture) বা বণিক–সংস্কৃতিতে আক্রান্ত হয়ে মনে করতে শুরু করেছি ছাত্র শিক্ষকের 'ওয়ার্ড' নয় 'ক্লায়েন্ট', 'হেফাজত' নয় 'খরিদ্দার' — একজন জ্ঞান বিক্রেতা, অপরজন ক্রেতা। তাই আজ 'শ্রদ্ধা' 'স্নেহ'— এই অনুভূতি দুটি ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে। যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে তা প্রধানত ইংরেজীতে যাকে বলা যায় Professional বা Working relation— পেশাগত বা কর্মগত সম্পর্ক। আসলে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে এই পরিবর্তনের ধারা শুধু এই দেশে এবং এই উপমহাদেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লক্ষ্য করা গেছে এবং তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পঞ্চাশ দশকে। ষাট, সত্তর, আশি দশক পেরিয়ে তা আজ চরম পর্যায়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শুধু শহর নগর জনপদ ধ্বংস হয়নি, প্রাণ সংহার হয়নি, মানুষের বিশেষ করে কিশোর তরুণদের সুকুমার বৃত্তিগুলোর প্রচুর ক্ষতি সাধন হয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তীকালে জীবনের বাস্তবতা এতো প্রকট, জীবন–সংগ্রাম এতো কঠোর হয়ে দাঁড়ালো যে, জটিলতায় জড়ানো জীবনপথে সবেমাত্র পা বাড়ানো তরুণ বয়সীদের শুধু বাইরের চেহারা নয়, মনও হয়ে উঠলো রুক্ষ, কঠিন। তারই প্রকাশ ঘটলো তাদের ব্যবহারে আচরণে। কোমল হয়ে উঠলো রূঢ়, বিনয়ী উগ্র, দুর্বিনীত। এতোদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ ধরনের উচ্চশিক্ষা অংগনে ছাত্র–শিক্ষকের সম্মিলিত যে শিক্ষা–প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো তাতে চিড় ধরলো, সম্পর্কে ফাটল দেখা দিলো। জন্ম নিলো এক আলাদা সংস্কৃতি— Student-Youth Culture. বা ছাত্র–যুব সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আন্দোলনের, সংগ্রামের, বাধাবন্ধনহীন জীবনের, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি–বন্ধন না মানার সংস্কৃতি, বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্কদের আদেশ উপদেশ, নীতিবাক্য বর্ষণ এড়িয়ে নিজদের এক পৃথক সত্তায় বিকশিত করার সংস্কৃতি। এই পৃথক সত্তা বোধ শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক শিথিল করে দিলো, 'হেফাজতে'র ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়লো। ছাত্রের দৃষ্টি শিক্ষককে একপাশে রেখে প্রসারিত হলো শিক্ষাঙ্গনের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে, অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। এতে ছাত্ররা কি পেয়েছে, কতটুকু পেয়েছে সে আলোচনায় না গিয়ে একথা বলা যায় যে একটা স্বতন্ত্র সত্তাবোধ, নিজদের বিকশিত করার প্রয়াস আজ নব্বই দশকে এসে শিক্ষককে প্রহার করার মতো বিকৃত মানসিকতায় পর্যবসিত হবে তা ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক কেউই ভাবতে পারেননি। একথা তো অনস্বীকার্য যে একশ'তে নব্বই জন নিয়ে যে সাধারণ ছাত্রসমাজ তাদের কাছে এই বিকৃত মানসিকতা কোন সময়ই গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং আজও নয়। এই–ই আজকে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার কথা, আশার কথা। আমাকে হয়তো কেউ অত্যন্ত আশাবাদী বলে আখ্যাত করতে পারেন, ছাত্রদের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করছি বলে অপবাদও দিতে পারেন। কিন্তু বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত শুধু তাদের নিজেদের নয়, এদেশের মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে, আশির দশকে স্বৈরাচারী শাসনের পতনের আন্দোলনে ছাত্ররাই ছিল অগ্রণী ভূমিকায়— এ সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চাশ, ষাট দশকে এবং একাত্তরে যাঁরা ছাত্রনেতা ছিলেন, তাঁরা কেউই আজ আর ছাত্র নেই, কিন্তু অনেকেই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে রয়েছেন, তাঁরা কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন যে পরবর্তীকালে দেশের ছাত্রসমাজের ওপর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেবে গজিয়ে ওঠা এই 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন', কালিমালিপ্ত করবে ছাত্র আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে, ছাত্রসমাজকে শিক্ষক প্রহারের, লাঞ্ছনার অপবাদ সইতে হবে? তারা আজ এগিয়ে আসতে পারেন না দলমত নির্বিশেষে এই কলঙ্ক মোচনের লক্ষ্যে?

আজ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত আলোচনায় এসব কিছুর জন্য অভিযুক্ত হচ্ছে ছাত্র–রাজনীতি, শিক্ষক–রাজনীতি, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষিত সচেতন সমাজের। সেই শিক্ষিত সচেতন সমাজের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষক এবং ছাত্র। সরকারী চাকরিতে রয়েছেন শিক্ষিত সমাজের এক অংশ। তাদের জন্য তো রাজনীতি নিষিদ্ধ। এমত অবস্থায় ছাত্র শিক্ষকদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দিলে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা কি একটা ক্ষুদ্র ক্ষীণ স্রোতে পরিণত হবে না? এতে সত্যিকার গণতান্ত্রিক বিনির্মাণ কি সম্ভব হবে? বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩–এ কি এমন কোন ধারা উপধারা আছে যা ছাত্রদের সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে প্ররোচনা দেয়? অভিযোগ উঠেছে ছাত্ররা 'ভায়লেন্ট', উগ্র হয়ে উঠছে। কিন্তু তাদের এই 'ভায়লেন্স', উগ্রতা শেখালো কে এবং এর সুযোগ নিলো, একে ব্যবহার করলো কারা? এসব প্রশ্নের বিশ্লেষণ এবং উত্তরের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কি একটা কথা ভুলে গেছি— এদেশের ষাট দশকের স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুব খানই ছাত্রশক্তিকে করায়ত্ত করার জন্য ছাত্রদের এই 'ভায়লেন্সের' পথে প্রথম টেনে এনেছিলেন? স্বাধীনতার পরেও দু'বার '৭৫ এবং '৮২তে 'ভায়লেন্স' দিয়ে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। আজ ওষুধে এমন উপাদান পাওয়া যায় যা নিরাময়ের পরিবর্তে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে, শিশুখাদ্যে বিষ থাকে। এগুলোও কি এক ধরনের ভায়লেন্স নয়?

ফেলে আসা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একটা ঘটনা দিয়ে আজকে কলাম শেষ করছি। এ ঘটনার কথা অনেকবার অনেক জনকে বলেছি। আবার বলছি। চল্লিশ দশকের কথা। আমরা ক'জনা কার্জন হলের কাছে একটা লিচু গাছ থেকে লিচু খেতে গিয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী এক গুন্ডার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম অধ্যাপক সত্যেন বসুর কক্ষে। আমরা কোন্ হলের, কোন্ বিভাগের, কিংবা অনুষদের ছাত্র— কোনও প্রশ্নই তিনি করেননি। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র— তাঁর কাছে এই–ই ছিল যথেষ্ট। আমাদের কক্ষের ভেতর রেখে সেই জ্ঞানতাপস একা বেরিয়ে এসেছিলেন অস্ত্রধারীর মুখোমুখি হতে। অস্ত্রধারী অবশ্য তাঁর সামনে আসতে সাহস পায়নি। এই ছিল সেদিনের শিক্ষক এবং শিক্ষকের হেফাজতি দায়িত্ব। আজকে অনেকের কাছে এ কাহিনী রূপকথার মতো শোনাবে। তবু আজও খুঁজে ফিরি সেই শিক্ষকদের।